Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 259 –266
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

পুলিশি ডিটেকশনের কালো দিক : সাহিত্যে থার্ড ডিগ্রির নজির

শৌভিক মুখোপাধ্যায়
ইমেইল : souvikmukherjee15@gmail.com

Keyword
Detection, Police, Crime, Nineteenth Century, Bengal, Calcutta, Memoirs, Crime Fiction.

Abstract
Crime is an Eternal Phenomena underlying beneath human civilization. It develops around human interest. It changes according to the evolution of society, culture and norms. As the civilization grows the relation between crime and punishment leads to a complex equation. But to punish anyone for a particular criminal act we need to detect his/her involvement in that crime at first. Police are the administrative instrument for that work. The first authority to conduct any legal investigation. Police may be get a confession from a suspect under police custody for a crime and according to all the evidence they prepare a charge sheet and produce him/her to the court for final punishment. To collect all that evidences they must get a clue or some important information to go through with the investigation. Born criminals are hard to crack. They are not willing to confess anything that goes against them. For this there are so many unique methods invented to break them. But sometimes it could be fatal for the suspect. There are not any fix rule or manuals for applying these and couple of baneful occasion it becomes a black mark on police administration.
In this article we are trying to find such examples and explore what are the possible reason behind this rigorous methodology? Are any worthy aspect or specific criminological background present against its defence?
We used several bengali article, novel and memoirs from nineteenth and twentieth century's bengali literature to collect necessary proofs in respect of this article.

Discussion

১

আটক মানেই ফাটক নয়! ফাটক মানেই কয়েদ নয়। কয়েদ মানেই শাস্তি নয়। এবং শাস্তিতেই সোয়াস্তি নয়। কারণ অপরাধী শায়েস্তা হলেই সব চুকেবুকে গেল এমনটা নয়, প্রকৃত তদন্তের অভিমুখ থাকে অপরাধের উৎসের দিকেও। অপরাধীরা সে অন্তিম গন্তব্যের অমোঘ পথ প্রদর্শক হলেও পেনাল কোড নির্ধারিত পেনাল্টি দেওয়ার জন্যে কেস সাজিয়ে আদালতে চালান দিয়ে ভারপ্রাপ্ত তদন্তকারির কাজ মেটে না। একথা তাদের ভালোমতনই জানা ছুটো-ফুটো কেসের ভয় জাত অপরাধীর কাছে শিমূলতুলোর চেয়েও পলকা। এক ফুঁয়েই তা উধাও হয়ে যাবে। জেল-হেফাজতে বরং অনেকের মাসকাবারি বন্দোবস্ত চলে। উনিশ শতকের এক মহাখলিফা ইদা জোলা যেমন নিজের জীবনের অর্ধেকই কাটিয়ে দিয়েছিল জেলের চৌহদ্দিতে। প্রত্যেকবার ছুটির সময় সে সহবন্দীদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলত,

"ভাই দেখিস, তোরা যেন আমার ভাতের হাঁড়িটা নষ্ট করিস্ না, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"[১]

এবং দিন কয়েকের ভিতরই আবার তার হাঁড়িতে চাল ফুটতে শুরু করত। সেকালের সায়েব ছোকরারা বাবুয়ানির দেনা শুধতে না পারলে হরিণবাড়ির বাসিন্দা হয়ে দেশীয় অপরাধীদের তুলনায় রীতিমত রাজার হালে দিন কাটিয়ে আসতেন। সুতরাং নিছক সাজা খানিক মজাও বটে। তা ছাড়া আদালতের এজলাসে কোনও কেস তখনই পৌঁছবে যখন পাকাপোক্ত প্রমাণ পুলিশের হাতে আসবে, অথবা এমন কোনও তথ্য যার তথ্যসূত্রেই ঘনীভূত রয়েছে দুর্নীতির খাসমহল। অপরাধী যদি তার হদিশ না দেয়, তবে তামাম খাটনি বেকার। তদন্তে যতই অপরাধী সন্দেহে কাউকে আটক করা হোক না কেন, আসামী একরার করতে নারাজ হলে তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ডিটেকশন-ডিডাকশনের আর কোনো দাম থাকবে না। তাই সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বেঁকাতে হয়। জেরার সুবাদে ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় এমন কিছু পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় যার সবটাই সাদা চোখে হয়ত ঠিক নয়। পরিস্থিতি সাপেক্ষে উচিত মনে হলেও আসলে তা ডিটেকশনের কালো দিক।

২

'গোপাল বড় সুবোধ বালক।' ঠিকই। কিন্তু অপরাধীরা কেউ 'গোপাল' নয়, 'রাখাল'-ও নয়। নানান ক্রাইমের হরেক ধরন। ক্রিমিন্যালেরও। অপরাধমনস্তত্ত্বের কারবারিরা বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধ তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফসল নয়। দীর্ঘ দিন ধরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় গড়ে তোলা বীজতলা। মাঠে নামার আগেই সম্ভাব্য প্রতিরোধের বিরুদ্ধে নেট প্র্যাকটিস সেরে নেয় চোর-ছ্যাঁচড়ে। যত 'ছিদ্দৎ'ই করা হয়, সহজে টসকায় না। দারোগার চোখে চোখ রেখে বুক ঠুকে বলে,

> "এই দেখুন যশোর জেলার এক পাপিষ্ঠ মুসলমান দারোগা তামাকের গুল পোড়াইয়া আমার জানুতে চাপিয়া ধরিয়াছিল।আমার জানুর মাংস চড়্ চড়্ করিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল, আমি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম বটে কিন্তু একরার করি নাই। পাবনার বিখ্যাত মৌলবী ওয়াসফউদ্দীন দারোগা ...আমার হস্তের নখের ভিতর কাঁটা ফুটাইয়া দেখিয়াছেন; তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই"[২]

এত অল্পে 'ভবি' ভোলে না। তা উনিশ শতকে দারোগারাও এতো অল্পের উপর দিয়ে যেতেন না। সেকেলে বিশ্বাস বলে 'বদমাএস জব্দ' করতে হলে শাস্তির ভিয়েনে কড়াপাকের প্রাধান্য থাকা চাই। দোষী যেন বুঝতে পারে, যে লাভের আশায় এ পথে সে নেমেছিল সে লাভ তো দূর অস্ত বাড়তি সুদের মাশুল গুণতে গুণতে প্রাণপাখিও জেরবার হয়ে যাবে। তবে এতো কোর্ট-কাছারির আদেশ জারির পরের অবস্থা। তার আগের ধকলও কম নয়।

কোতোয়ালিতে ঢুকে কপালের ঘাম মুছে সবেমাত্র একটু বসেছেন কি বসেননি, বড় কর্তা বললেন, শোনো হে! অমুক গ্রামের অমুক জায়গায় কী যেন গোলমাল হয়েছে খবর পেলাম। শিগগির বেরিয়ে পড়ো। একটু তদারক করে এসো দেখি। অল্পদিনেই কাজ সেরো। বেশিদিন হলে আবার আমাকে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। এই নাও পরোয়ানা। পরোয়ানা-শিলমোহর ট্যাঁকে গুঁজে, ধড়াচুড়ো পাল্টে বরকন্দাজের সঙ্গে ছুটলেন দারোগা।[৩] মুহূর্তের মধ্যে গ্রাম জনশূণ্য হয়ে গেল। ডাকাত পড়ার মতই ভয়ঙ্কর ছিল 'দারোগা পড়া'। মহামহিম হুজুরের ভিজিট দিতে দিতে আসামী-ফরিয়াদী দুজনেই ট্যাঁকখালির জমিদার। মনোমত নজরানার অভাবে কোতোয়ালিতে চালান। সরাসরি থার্ড-ডিগ্রি। কথা কম, কাজ বেশি। উপায়ই বা কী? মিয়াজানের জবানে আক্ষেপ ঝরে পড়ে, 'আমরাই বা কী করব, হয়তো ডাকাতি হয়েছে আমাদের থানা এলাকায়, হাকিমের পরোয়ানা এল দশদিনের ভিতর যদি চোরাই মাল আর ডাকাতদের হদিশ করা না যায় তাহলে নোকরি খতম। আমারও হাকিম হুজুরকে সওয়াল করতে ইচ্ছে করে, যদি সরকার তাঁকে হুকুম করত তাঁর জেলায় ঘটে যাওয়া কোনো অপরাধের কিনারা দশ দিনের ভিতর করতে না পারলে তাঁকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে, তাহলে তখন তিনি কী করতেন? তখনও কি তিনি এখনকার মতোই বলতে পারতেন অপরাধের কিনারা করতে আমরা যে আঙুল মোচড়ানোর কায়দা ইস্তেমাল করে থাকি সেটা ভয়ানক, বিশেষ করে তাঁর সামনে যখন আর অন্য উপায় নেই।'[৪]
'*সেকালের দারোগা কাহিনী*-তে ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠে এসেছে,

> "পূর্ব্ব দারোগারা অনেকে ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ কার্য্য করিতেন, এমন নহে। অধিক সময়ে তাঁহারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের হুকুমের ভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন।"[৫]

কারণ উর্ধ্বতন কর্তারা বলেই দিতেন,

> "দারোগা তিন (কিম্বা মোকদ্দমার গুরুত্ব বুঝিয়া সাত) দিবসের মধ্যে আসামি হাজির কিম্বা মোকদ্দমার কেনার্ করে, যদি সে এই সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য করিতে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আপনাকে সাসপেন্ড (কিংবা কোনও স্থলে পদচ্যুত) বিবেচনা করিয়া, নায়েব দারোগার হস্তে শীলমোহর অর্পণ করিয়া, জবাবদিহির নিমিত্ত হুজুরে হাজির হয়।"[৬]

তাই জবাব এড়াতে জুলুমের বন্দোবস্ত। কারণ, 'বাড়িতে আরামে আয়েশে বসে একজন হাকিম জোরজুলুম বন্ধ করার পক্ষে সওয়াল করতেই পারেন। আমার জানতে ইচ্ছে করে এইরকম কায়দা ইস্তেমাল না করলে আমরা কেমনভাবে ভয়ানক সব অপরাধের সুলুক পাব? বেশিরভাগ মামলাতেই তো কী আসামি কী ফরিয়াদি তরফকে দেখা যায় সবকিছু ঢাকাচাপা দিতে ব্যস্ত।'[৭]

আজকাল তো শুধু উপরওয়ালাই নিম্নচাপ ঘনিয়ে তোলেন না, মিডিয়ার প্রেশারকুকারে প্রতিমুহূর্তে টেনশনের বাষ্প জমে ঊর্ধমুখী। তাই তরিকায় কিছু বদল এলেও ঘুরপথে কবুলনামা আদায় করার রাস্তা খোলা না রেখে উপায় নেই। এজলাসে দাঁড়িয়ে একটি মাত্র অস্বীকারে রেহাই পাওয়ার রাস্তা খুঁজে নিতে পারে অপরাধী, মিথ্যে করে দিতে পারে তার প্রতি সমস্ত অভিযোগ। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে কাউকে বিনা কারণে জেল-হেফাজতে আটকে রাখার নিয়ম নেই। তাই অপরাধের হদিশ খুঁজে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হলে থানা থেকে আদালতে চালান করার মাঝের সময়টুকু তদন্তকারি অফিসারের কাছে চরম গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই নির্ধারিত হয়ে যায় ডিটেকশনের পরবর্তী পর্যায়। তার জন্যে অপরাধীর আত্মবিশ্বাস ভাঙা সবচেয়ে জরুরি।

৩

'দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক কনস্টেবলের নাম ধরে হাঁক পাড়লাম। সে মুহূর্তের মধ্যে হাজির। বললাম, "দরজাটা ভেজিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি একে বেবুন বানাব।" কনস্টেবল আমার কথাটার অর্থ বুঝে চেম্বারের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তখন 'বেবুন' কথাটা খুব চালু ছিল আমাদের মধ্যে। 'বেবুন বানানোর' অর্থ পশ্চাদ্দেশে ডাণ্ডা দিয়ে মেরে বেবুনের মতো পেছনটা লাল করে দেওয়া।'[৮] এই স্মৃতিচারণ খুব পুরনো নয়। বিশ শতকে লালবাজারের এক অফিসারের এই কায়দার পাশে সেকেলে কৌশলের দু-চার উল্লেখ রাখা যাক। টাইমমেশিনে চেপে উনিশ শতকে তেজপুর থানার চৌহদ্দিতে পৌঁছলে দেখা যাবে,"একটা জিনিস, দেখতে এত মামুলি যে মাটিতে পড়ে থাকলেও কেউ খেয়াল করবে না, তা হচ্ছে এক টুকরো বাঁশ। বড়জোর ইঞ্চি দশেক লম্বা আর ইঞ্চি তিনেক চওড়া। চিরুনির মতো চারটে ফালা করা। ফালাগুলো যাতে টুকরো টুকরো না হয়ে যায় তার জন্য শেষে একটা গাঁট থাকে। কোনো বেয়াদবকে শায়েস্তা করতে হলে তার একটা আঙুল এর মধ্যে ঢুকিয়ে মুখগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় বা হাত দিয়ে চাপ দেওয়া হয়, যেমনটা সুবিধে। টুকরোগুলো একসঙ্গে চেপে ধরলে কী হবে বুঝতেই পারছেন।"[৯] শুধু বোঝা! হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারা যাচ্ছে। 'থানার জবরদস্তির আরেকটা কায়দা হল ' ঘুরঘুরে' বলে ছোট্ট একটা পোকা। দিনের বেলায় তাকে ঘর থেকে বের করে আনলে সে নিজের জন্য মাটিতে এমন গর্ত খুঁড়বে যে দেখলে তাজ্জব হতে হয়। পোকাটার মুখের দু ধারে পাখার মতো বেরিয়ে থাকে চোয়ালের শক্ত হাড়। একেবারে করাতের দাঁতের মতো ধারালো। শক্ত থেকে শক্ত জমিতে সে এই দিয়ে নিমেষে গর্ত খুঁড়ে ফেলে।'

> "পোকাটাকে ... কাজের লাগানোর কায়দাটা হচ্ছে; বেয়াদবের জামাকাপড় খুলে, হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে চিত করে শুইয়ে দেওয়া। তারপর তার নাভির ওপর পোকাটাকে রেখে চাপা দেওয়া হয় আধমালা নারকোলের খোলা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় তার কাজ। শক্ত জমির বদলে ফুটো হতে থাকে নাভি। বজ্জাতটা যে ফুলের বিছানায় শুয়ে নেই সেটা মালুম হয় তার চিৎকারে।"[১০]

এই পদ্ধতি অবশ্য থানারই একচেটিয়া নয়।

"...খাজনা হাসিল করতে জমিদারের কাছারিতেও মাঝেমাঝে এই কায়দার ইস্তেমাল হয়।"[১১]

'থানায় আরেক রকমের জুলুম চলে যেটা খুবই নোংরা আর ভয়ানক। যে লোক এই কায়দাটা ফেঁদেছিল বা যারা এর ইস্তেমাল করে তাদের নিয়ে কিছু বলার নেই। এটা একটা সহজ কসরত। কোনো লোককে দুটো বাঁশের মধ্যে ফেলে চাপ দেওয়া। কিন্তু কায়দাটা খুবই খতরনাক। চাপ সবসময় ঠিকঠাক হয় না, তার উপর যাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে তার ক্ষমতা কতটা সেটাও অজানা। তাই সময় সময় সর্বনাশ ঘটে যায়।'[১২] 'তুড়ুম'[১৩] -এর বেশি ডোজের পাশাপাশি কম ডোজের দাওয়াইও ছিল। চলত চাবুক। এসব দিনে কেউ চট করে কোতোয়ালির চৌহদ্দি মাড়াতে চাইত না।[১৪] তাই বাইরেও খবর পৌঁছত না। কেউ যদি দেখেও ফেলে, তাকে চুপ করানোর জন্যে এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে,

"থানায় যা দেখ তাহা বাহিরে কাহাকেও কহিতে নাই, যদি কেহ বলে, শ্যামচাঁদের[১৫] প্রহার লাভ হয়।"[১৬]

পরে অবশ্য এমন প্রকাশ্যে জুলুম চলত না, ইন্টারোগেশন চেম্বারের দেওয়াল পেরিয়ে তাই এখনও অনেক নজির বাইরে আসেনি। অধস্তনের হাতে প্রাথমিক কারুকার্য[১৭] শেষেও অপরাধী দোষ কবুল না করলে আসরে নামতেন উর্দ্ধতন অফিসার। চোরাগোপ্তা আক্রমণে তৈরি মানসিক চাপানউতোরে নাজেহাল হয়ে অপরাধী মাটি নিত। অধিকাংশ সময়েই অভিযুক্তের পরিবারের ভবিষ্যৎ ক্ষতি অথবা নির্যাতনের কথা বলে তার মানসিক প্রতিরোধের দেওয়ালের ধসিয়ে দেওয়া হত, নয়ত পরিবারের সদস্যদের কাছে অভিযুক্তের প্রতি সম্ভাব্য অত্যাচারের কথা বলে ভয় দেখিয়ে তদন্তের অনুকূলে কোনও সূত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুন্সী শেখের পরিবারের থেকে এভাবেই খবর আদায় করে চোরাই মাল উদ্ধার করেছিলেন গিরিশচন্দ্র বসু। অপরাধীর আবদারে সায় দিয়ে তার বিশ্বাস অর্জন করে অনেকসময় কার্যোদ্ধার হয়েছে[১৮] অথবা নেশা দ্রব্য সামনে রেখে প্রলোভিত করেও পেট থেকে কথা বার করতেও কসুর ছাড়া হয় নি।

অপরাধীর পাশাপাশি অপরাধের সহায়কদের থেকেও কম ভোগান্তি হয় না। তাদের থামাতেও কখনও সখনও সিধে গলি ছেড়ে বেপাড়ায় হেঁটে আসতে হয়। একারণেই লালবাজারের সেন্ট্রাল লক-আপে কয়েদীদের দেখভালের জন্য নিযুক্ত এক ডাক্তারকে বাধ্য হয়ে প্যাঁচে ফেলেছিলেন রুণু গুহ নিয়োগী। ধর-পাকড়ে ডাকাতরা ধরা পড়ে, সামান্য শারীরিক অস্বাভাবিকতা নজরে এলেই ডাক্তার তাদের স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে লকআপ থেকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন। ঠিকমতো জেরার অভাবে তদন্তকারি অফিসার হাত কামড়ান। ডাকাতি চলতেই থাকে। অগত্যা একদিন সেই ডাক্তারকে পানাহারের নিমন্ত্রণ করে তাঁর পানীয়ের সঙ্গে কৌশলে মিশিয়ে দেওয়া হল 'অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট'। সে ওষুধের ঘোর কাটার পর ডাক্তার আর আপাত নির্বিষ কারণে অপরাধীদের জেল হাজতে পাঠিয়ে তদন্তে বাগড়া দেওয়ার সাহস করেননি।[১৯]

৪

ভয়। একবার কারুর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারলেই তাকে সহজ কাবু করা যায়। তারপরে তাকে যা বলা হয় তার অন্যথা করে না। চিরকালই পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে আমজনতার মনে চোরাগোপ্তা ভয়ের দখল জারি হয়ে আছে। আর এই ভয়ের সুবাদেই একদিকে যেমন জেরায় উঠে এসেছে সমাধান সূত্র, আবিষ্কৃত হয়েছে অপরাধের অনাবিষ্কৃত অঞ্চল তেমনই এই ভয়কে হাতিয়ার করে তদন্তের দিগ্‌নির্দেশে ইচ্ছেমতন হস্তক্ষেপের অভিযোগও রয়েছে বিস্তর। সেন্ট্রাল লক-আপের থার্ড ডিগ্রি অধ্যুষিত অঞ্চল পেরিয়ে কেউ বা পঙ্গু হয়েছে গেছে, কেউ মানসিক স্থিতি খুইয়ে বদ্ধোন্মাদ।[২০] অনেক সময় পুলিশ হেফাজতে অপরাধীর মৃত্যুর পিছনে রাজনীতি আর অপরাধের যোগসাজশ আড়াল করার গুজব উঠেছে।[২১] নিরপরাধ মানুষকেও দারোগার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মিথ্যে অভিযোগ নিজের কাঁধে নিতে না চাওয়ায় অমানবিক জেরার কবলে পড়ে প্রাণ খোয়াতে হয়েছে।[২২] মহিলা সন্দেহভাজনের ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতনের পাশাপাশি তার অশালীন আচরণে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে কবুল করানোর চেষ্টা হয়েছে নিরন্তর[২৩]। সে অত্যাচারের চেয়ে মৃত্যু হয়েছে পরম প্রার্থনীয়।

কলকাতা পুলিশের অন্যতম দক্ষ দারোগা পঞ্চানন ঘোষাল মানবমনে অপরাধস্পৃহার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছিলেন,

> "এক কথায় শিক্ষা, সংস্কার ও ভয় বেশি থাকলে, অপরাধ-স্পৃহা অন্তর্মুখী হয় অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে শিক্ষা, সংস্কার ও ভয় কম থাকলে বা বিপরীত শিক্ষা ও সংস্কার প্রবল হলে বা ভয় অপসারিত হলে, এই অপরাধ বা অপরাধ-স্পৃহা বহির্মুখী হয় অর্থাৎ জাগ্রত হয়।"[২৪]

সেই জেগে ওঠা অপরাধস্পৃহাকে ঘুম পাড়িয়ে অপরাধী কব্জা করতে প্রাথমিক ভাবে জেরায় ভয়ের আবহ তৈরি করার সাপেক্ষেও তর্ক হয় বিস্তর। "নিজেকে অপরাধী মনে হলেও বৃহত্তর সমাজের স্বার্থেই যে এমন নির্মম"[২৫] হওয়ার সপক্ষে প্রতিযুক্তি ওঠে পুলিশ প্রশাসনের তরফেও, তবু অনেক কথাই বাকি থেকে যায়। আর ক্রমশ এই বিশ্বাস আরও জেঁকে বসে 'পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা।'

তথ্যসূত্র :

১. বসু, গিরিশচন্দ্র, সেকালের দারোগার কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, কলকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৭১

২. তদেব, পৃ. ২৭৫

৩. "ছোট একটা মকর্দমার তদন্ত সারিয়া—তিনদিন ক্রমান্বয়ে গো-শকটে আসিয়া বাসায় পৌঁছিয়াছি, সহকর্মীর দয়ার শরীর—কুশল জিজ্ঞাসার পূর্বেই জানাইয়া দিলেন, শ্রীযুক্ত কর্তা সাহেব বড় চটিয়াছেন। ঘড়ি ঘড়ি সংবাদ লইতেছেন। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, নিদ্রায় চক্ষু ভাঙিয়া পড়িতেছে, শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে;--বিশ্রাম করিবার অবসর পাইলাম না। তাঁবুতে গিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব, মেমসাহেবের সহিত এতক্ষণ বেশ রঙ্গরহস্য করিতেছিলেন—মুখভরা হাসি ছিল; আমাকে দেখিয়াই গম্ভীর। বামপদের টক্করে কেদারাখানা দূরে ফেলিয়া দিয়া, সাহেব একেবারে আমার আধহাত তফাতে আসিয়া হাজির। খুব রাগ প্রকাশের ভঙ্গিতে বড়সাহেব বলিলেন,'তোমার কি ইয়াদ নাই? এই ছোট ছোট মকর্দমার তদন্তে এত বিলম্ব। বড়ই দোষের কথা। সাবধান হও। ওই ডাইরি দেখ।–আজই রওনা হও। একমাস সময়, ঠিক গণা ত্রিশটি দিনের ভিতর তদন্ত শেষ করা চাই।'"
হারানী। বাঁকাউল্লার দপ্তর, সম্পাদনা : সৌম্যেন পাল, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, কলকাতা : চর্চাপদ, জানুয়ারি, ২০১৩্ পৃ. ৮৬

৪. মিয়াজান দারোগার একরারনামা, অনুবাদ : অরিন্দম দাশগুপ্ত, কলকাতা: চর্চাপদ, প্রথম বাংলা সংস্করণ : জুন ২০০৯, পৃ ১১৭

৫. বসু, গিরিশচন্দ্র, সেকালের দারোগার কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৮৯

৬. তদেব

৭. মিয়াজান দারোগার একরারনামা, অনুবাদ : অরিন্দম দাশগুপ্ত, কলকাতা : চর্চাপদ, প্রথম বাংলা সংস্করণ : জুন ২০০৯, পৃ. ১১৬ - ১১৭

৮. নিয়োগী, রুণু গুহ, সাদা আমি কালো আমি, ২য় খণ্ড, কলকাতা : এম.এল.দে. এণ্ড কোং, দ্বিতীয় প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা, ২০০১, পৃ. ১৭ - ১৮

৯. মিয়াজান দারোগার একরারনামা, অনুবাদ : অরিন্দম দাশগুপ্ত, কলকাতা : চর্চাপদ, প্রথম বাংলা সংস্করণ : জুন ২০০৯, পৃ. ১১৬

১০. তদেব, পৃ. ১১৭ - ১১৮

১১. তদেব, পৃ. ১১৮

১২.তদেব

১৩. "তুড়ুম জিনিসটা কি, তাহা বোধ হয় আমার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে জানেন না। তুড়ুম শব্দ ফরাসী ভাষা। ইংরাজিতে ইহাকে Stocks বলে। দুইখানা লম্বা ভারি কাষ্ঠ একদিকে শক্ত লোহার কব্‌জা দ্বারা আবদ্ধ, অন্যদিক খোলা; কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিকলের দ্বারা বন্ধ করা যায়। এই খোলাদিকের মাথা ধরিয়া উপরের কাষ্ঠকে উঠান নামান যাইতে পারে। প্রত্যেক কাষ্ঠেই কয়েকটি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় এমন ভাবে ছিদ্র করা আছে যে একখানা কাষ্ঠের উপরে দ্বিতীয়খানা পাতিলে দুই ছিদ্রে একখানা গোলাকার ছিদ্র হয়। আসামিকে বসাইয়া কিম্বা শুয়াইয়া তাহার দুই পা একখানি কাষ্ঠের, দুই ছিদ্রের ভিতরে রাখিয়া উপরের কাষ্ঠ দ্বারা তাহা চাপা দিলে পা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয় এবং আসামি আর নড়িতে পারে না। বিশেষ কষ্ট দেওয়ার মানস থাকিলে, পার্শ্ববর্ত্তী দুই ছিদ্রে পা না দিয়া, এক ছিদ্রমধ্যে রাখিয়া অন্তরের দুই ছিদ্রে পা আটকাইলে মানুষের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। রাত্রিকালে দুরন্ত আসামিদিগকে নিশ্চিন্তরূপে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত সকল থানাতে ইহার এক একটা তুড়ুম ছিল।"

বসু, গিরিশচন্দ্র, সেকালের দারোগার কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু। কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৭৬

১৪. "যে সময়ে দারোগা সাহেবের কাছারি গরম হইত, বিরু-বরকন্দাজ চোরেদের সম্মুখে সের খাঁ, সমসের খাঁ, রামচাঁদ, শ্যামচাঁদ নামা মুষ্টি-প্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়া রাখিত, চামড়ে হাতকড়ি কসে বাঁধিত, তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপদ মধ্যেও যাইতাম না।"

বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, জটাধারীর রোজনামচা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ১, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু। কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৭৫

১৫. "এই অস্ত্রটির গঠন সকল কুঠীতে এক রকম ছিল না। কুঠী বিশেষ এবং নীলকর কিম্বা দেওয়ানজির দয়ার তারতম্য অনুসারে তাহা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিত। কোনও স্থানে একটি লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্ম্মের একখানা হাতা এবং কোন স্থানে হাতার পরিবর্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েক ছড়া চর্ম্মের রজ্জু বান্দা থাকিত। ইহার এক আঘাতে গবর্ণমেণ্টের আদালতের বেতের বহু আঘাতের ফল হইত। দশ ঘা বেত খাইলে মনুষ্যের যে কষ্ট না হইত, শ্যামচাঁদের এক ঘায়ে তাহার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। শ্যামচাঁদ নামক এইরূপ এক অস্ত্র ইন্ডিগো কমিশন সাহেবদিগের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।"

বসু, গিরিশচন্দ্র, সেকালের দারোগার কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৫৮

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, জটাধারীর রোজনামচা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ১, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৭৫

১৭. উনিশ শতকের আরও কিছু থার্ড ডিগ্রির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে অধ্যাপক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "We hear of the following practices used in the police thanas of Bengal, described in their respective police slang; (i) sarbat khaoano, meaning thrusting urine down the throat; (ii) rule deoa, forcing a rod into the rectum; (iii) shilpakarjya, literally suggesting a work of art, but actually meaning the insertion of needles into the nails; (iv) dalan, meaning pressing on a person's body with a bamboo log; (v) dolon, in which a person is hung, with his head usually downwards, from a horizontal pole suspended from ceiling; and (vi) krishnachura, (the red-coloured shrub of bougainvillea), the name of a punishment where the hands of the accused are tied behind him, and he is forced to raise them upwards in an extremely painful exercise.".

Banerjee, Sumanta. The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta. Orient Blackswan. 2009. Page. 452

১৮. খোদ শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের ঘর থেকেই একবার চুরি হয়। চুরির সামগ্রী খুব সামান্য ছিল না, ' ঈশ্বরবাবুর কোট, পেন্টেলুন, কামিজ প্রভৃতি অনেক পরিধেয় বস্ত্র ও পোষাক, ফুলাল তৈলের ও শেরির ৪টা বোতল ও নানাবিধ কাঁচের গ্লাশ, কাঁটা চামচ, স্ক্রুপ, সোনার ঘড়ি ও চেন, রূপার গেলাস বাটী, রেকাব, হুঁকা, গুড়গুড়ী, পানের ডিপা, সোনার নস্যদানী ও একটা পেনসিল কেস, নগদ কয়েকখানা গিনি মোহর ও প্রায় ১০০ টাকা...।' এর মধ্যে বেশিরভাগ জিনিস উদ্ধার হলেও সোনার ঘড়ি উদ্ধারের জন্যে দারোগামশাইকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোরের কথায় সায় দিতে হয়েছিল। অবশিষ্ট চোরাই মালের কথা কবুল করার আগে ছিরা চোর রীতিমত পেটপুরে খাওয়া দাওয়া করে, দারোগাবাবুর ধুতি চাদরে সেজে নিজ প্রেয়সীর সঙ্গে এক রাত কাটিয়ে পরেরদিন লুকোনো জায়গা থেকে চুরির সামগ্রী বের করে দেয়।

বসু, গিরিশচন্দ্র, সেকালের দারোগার কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩, সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, পৃ. ২৬১ - ২৭১

১৯. নিয়োগী, রুণু গুহ, সাদা আমি কালো আমি, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা : এম.এল.দে. এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ : ২৬ জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ২৪ - ৩১

২০. চৌধুরী, সুপ্রিয়, পাতালপুরাণ, কলকাতা : The Café Table, দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২২, পৃ. ৭৯

২১. তদেব, পৃ. ৬৩

২২. 'কার্তিককে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলে একজন বরকন্দাজ নিখুঁতভাবে সাড়ে তিন হাত জমি মেপে দেগে দিল। কার্তিককে হুকুম করা হল এমনভাবে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে, যাতে ওই দাগগুলো ছুঁতে পারে। একটা জরিপ করার কাঁটা খুলে ধরলে যেমন হলে সেইরকম। শুনে যতটা সহজ মনে হচ্ছে কাজটা করা মোটেই তত সহজ নয়। খুব বেশি হলে কার্তিক লম্বায় হবে পাঁচ ফুট। শরীরের উপরটা লম্বা, পা দুটো ছোট ছোট, পেটটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। মাটিতে দাগ দেওয়া জায়গাটা দেখে ভয়ের চোটে ওর তোতলামি শুরু হয়ে গেল।'...'কার্তিককে দাগ দেওয়া জায়গার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হল, বরকন্দাজরা চেষ্টা করছিল ওর পা দুটো টেনে দাগের কাছে নিয়ে যাওয়ার।...সে বুঝতে পেরেছিল ওই চেষ্টা করতে গেলে শরীর চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাবে। শেষে কাঁপতে কাঁপতে ও আচমকা বেহুঁশ হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।'...'তারপর ও একটা ভাঁড় এনে হাজির করল। তার মধ্যে কয়েকটা শুকনো লঙ্কা রেখে ওপর থেকে চাপাল জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। লঙ্কাগুলো পট্‌পট্‌ করে ফাটতে শুরু করলে এমন ধোঁয়া আর গন্ধ বেরোতে লাগল যে আমরাই হেঁচে-কেশে অস্থির। এবার ছকু সেই ভাঁড়টা নিয়ে রাখল কার্তিকের মাথার কাছে। তারপর ঘরের কোনা থেকে একটা চটের বস্তা তুলে নিয়ে ঢেকে দিল কার্তিকের মাথা আর ভাঁড়টা। ...হাঁচতে হাঁচতে আর কাশতে কাশতে তড়াক করে খাড়া হয়ে বস্তাটা ছুঁড়ে ফেলল কার্তিক।' 'কিন্তু ছকু তখন খেপে উঠেছে। ... তাই ও এবার ঘরের চাল থেকে দড়ি ঝোলানোর শেষ হুকুম জারি করল, তারপর নিজেই পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল কার্তিকের হাতদুটো। হাত বাঁধার সময় কার্তিক কোনো আপত্তি করল না।ওর সঙ্গে ঠিক কী হতে চলেছে সেটা ও তখনও বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু চাল থেকে ঝোলানো দড়িটার দিকে নজর পড়তেই ওর কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ও শুরু করে দিল চিৎকার। ছকুর ঘাড়ে তখন শয়তান ভর করেছে। দড়ির শেষ গিঁটটা নিজের হাতে ভালো করে দিয়ে যে বরকন্দাজ সেটার অন্য দিক ধরে দাঁড়িয়েছিল তাকে সরিয়ে নিজেই পাগলের মতো টান দিল।আমি শুধু শুনতে পেলাম একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। টিমটিমে বাতির আলোয় নজরে এল উপর থেকে কিছু একটা ঝুলে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতিটা নিভে গেল। চারিদিক অন্ধকার।' এবং কার্তিকের স্বর্গপ্রাপ্তি। ছকু জমাদার পরে রেগে গিয়ে বলেছিল, "শালা যে কী করে ফৌত হল আমার মাথায় ঢুকছে না, মনে হয় ভয়ের চোটেই ফৌত হয়ে গেছে। এইসব তিলি, তামুলি জাতের লোকেরা সহজে মরে না। একবার একটা ডোমকে হাত-পা বেঁধে সারা রাত ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সকাল হলে দড়ি খুলে দেখি একেবারে বুলবুলের মতো তাজা! এক সের চিঁড়েগুড় খেয়ে নিল! এই তামুলিগুলো হচ্ছে আসল বজ্জাত, এদের জন্মই হয়েছে আমাদের

ঝামেলায় ফেলবে বলে। দড়ি ছিঁড়ে গেল, হাত পর্যন্ত খুলে এলো না আর শালা কিনা ভয়ের চোটে ফৌত হয়ে গেল।"

মিয়াজান দারোগার একরারনামা, অনুবাদ : অরিন্দম দাশগুপ্ত, কলকাতা : চর্চাপদ, প্রথম বাংলা সংস্করণ : জুন, ২০০৯, পৃ. ৪১ - ৪৫

২৩. "সেলের মধ্যে আবার এস. আই সেপাইদের চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিয়ে দিলো এবং বললো,'এবার সে কথা বলবে।' তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চীৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।"

"৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস.আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো।এরপর আমার ডানপায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময়ে আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস.আইকে বিড়বিড় করে বলতগে শুনলাম: আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস.আই এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।" (আদালতে ইলা মিত্রের জবানবন্দি - ১৯৫০)

মূল তথ্যসূত্র : সেন, সত্যেন, বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন, ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনী, পৃ. ১১২ - ১১৬

আমাদের ব্যবহৃত তথ্য সূত্র : ইলা মিত্রের জবানবন্দি। সম্পাদনা : শেখ রফিক, ঢাকা : বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৫, পৃ. ১৬ - ১৭

২৪. ঘোষাল,পঞ্চানন, অপরাধবিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : লালমাটি, লালমাটি সংস্করণ : বইমেলা, ২০১৮, পৃ. ৪৯

২৫. নিয়োগী, রুণু গুহ, সাদা আমি কালো আমি, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা : এম.এল.দে. এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ : ২৬ জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ২৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ইলা মিত্রের জবানবন্দি বইটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রণিতা চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই।